একক ৩৭ ❐ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রথম সোপানা—বাংলা

গঠন ঃ

৩৭.০ উদ্দেশ্য
৩৭.১ প্রস্তাবনা
৩৭.২ সিরাজউদ্‌দৌল্লা ও পলাশীর যুদ্ধ
৩৭.৩ মীরজাফর ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৭৫৭-১৭৬০)
৩৭.৪ মীরকাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৫-১৭৬৪)
৩৭.৫ ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভ
৩৭.৬ সারাংশ
৩৭.৭ অনুশীলনী
৩৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গো সিরাজউদ্‌দৌল্লার বিরোধের কারণ ও পলাশীর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট।
- মীরজাফরের সঙ্গো ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক ও বাংলার নবাব পদ থেকে মীরজাফরের অপসারণ।
- মীরকাশিমের সঙ্গো ইংরেজ কোম্পানির বিরোধ ও বক্সার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট।
- ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি লাভ ও তার তাৎপর্য।

৩৭.১ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার ফলে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ভারতীয় শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিতে এগিয়ে এসেছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। মুনাফা ও বাজারের লোভে ইংরেজরা ভারতবর্ষে একটি আগ্রাসী নীতি গ্রহণের অপেক্ষায় বসেছিল। যে মুহূর্তে ভারতীয় শক্তিসমূহের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেই মুহূর্তে তাদের আগ্রাসনমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইরেজ শক্তি ভারতবর্ষকে একটি লাভজনক উপনিবেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তারা জানত যে, ভারতে রাজনীতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সেখানে তাদের অর্থনৈতিক

লুণ্ঠন চালানো অনেক সহজ হবে। কূটনৈতিক দক্ষতা, সামরিক উৎকর্ষ এবং ভারতীয় শক্তিবর্গের অনৈক্যকে পুঁজি করে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব—ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সচেতনভাবে কি করে বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। নিজেদের স্বার্থে নবাব বদলের পালায় অংশ নিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

৩৭.২ সিরাজউদ্‌দৌল্লা ও পলাশীর যুদ্ধ

সমৃদ্ধশালী ও সম্পদশালী বাংলাদেশে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত ছিল। ১৭১৭ খ্রীঃ থেকে তৎকালীন মোগল সম্পরাট ফারুখশিয়ারের ফর্মানের সুবাদে ইংরেজ কোম্পানি কতগুলি বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করত। এই ফর্মান অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানি আমদানিকৃত ও রপ্তানিকৃত পণ্যের ওপর কোনরকম শুল্ক দিত না এবং এই পণ্য পরিবহনের জন্য কোম্পানি দস্তক প্রকাশ করার অধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বেসরকারি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন সুযোগ-সুবিধা এই ফর্মান দেয়নি। ফলে কোম্পানির কম৪চারীরা তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য পণ্যসামগ্রী পরিবহনের সময় প্রায়ই দস্তকের অপব্যবহার করত। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে তাই বাংলার নবাবদের তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খান থেকে আলিবর্দী খাঁন পর্যন্ত সমস্ত নবাবই দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোরতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

মৃত্যুর আগে আলিবর্দি খান তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্‌দৌল্লাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ১৭৫৬ সালের এপ্রি মাসে আলিবর্দি খান মারা গেলে বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত হন সিরাজউদ্‌দৌল্লা। কিন্তু সিরাজের সিংহাসন আরোহণ অনেককেই অসন্তুষ্ট করেছিল। আলিবর্দির আর এক দৌহিত্র পূর্ণিয়ার ফৌজদার সৌকত জং বাংলার মসনদ লাভ করার জন্য লালায়িত ছিলেন। সিরাজের এক মাসী ঘসেটি বেগমও বাংলার মসনদ পেতে আগ্রহী ছিলেন। ঘসেটি বেগম মুর্শিদাবাদের কাছে মতিঝিল অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি ও সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীর অধিকারী ছিলেন। আলিবর্দি খানের প্রধান সেনাপতি বা ‘বক্সি’ মীরজাফরও সিরাজের প্রতি বিরূপ ছিলেন। সিংহাসন বসেই সিরাজ বুঝতে পারেন যে তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেছে।

একই সঙ্গে সিরাজউদ্‌দৌল্লা ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। সিংহাসন আরোহণের অল্প কিছু দিন পরেই, ১৭৫৬ সালের ১০ই এপ্রিল সিরাজ কৃষ্ণদাসকে তাঁর হাতে অর্পণ করার দাবী জানিয়ে ইংরেজ কোম্পানিকে একটি চিঠি দেন। কৃষ্ণদাস ছিলেন ঢাকার জায়গীরদার রাজবল্লভের পুত্র। কৃষ্ণদাস সরকারি কোষাগার থেকে ৫৩ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে ইংরেজ কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি কৃষ্ণদাসকে সিরাজের হাতে অর্পণ করেনি। সিরাজ ক্রমে জানতে পারেন যে ইংরেজরা তাঁর দুই প্রতিপক্ষ সৌকত জং এবং ঘসেটি বেগমের

সঙ্গো গোপন আঁতাত গড়ে তুলেছে। সৌকত জং-এর উপদেষ্টা গোলাম হোসেন খানের লেখা থেকে জানা যায় যে সৌকত জং তাঁর নবাব হবার প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সাহায্য পাবার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন।

নিজ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সিরাজ কতকগুলো পদক্ষেপ নেন। তিনি ঘসেটি বেগমের প্রচুর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। মীরজাফরকে ‘বক্সি’ পদ থেকে অপসারিত করা হল। পরিবর্তে সিরাজ তাঁর বিশ্বস্ত মীরমদনকে ‘বক্সি’ পদে নিয়োগ করেন। সিয়ের-উল-সুতাক্ষারিণের লেখক গোলাম হোসেন খানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই সময় আলিবর্দির সময়ের সামরিক নেতা ও শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা সিরাজের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। নবাবের দেওয়ান রায়দুর্লভও নবাবের বিরুদ্ধে চলে যান এবং তিনি পশ্চিমবাংলার জমিদারদের সিরাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে শুরু করেন। ১৭৫৭ সালের গোড়ার দিকে বর্ধমান, বীরভূম ও নদীয়ার জমিদারেরা সিরাজউদ্‌দৌল্লার বিরোধী হয়ে ওঠেন। সি. এ. বেইলি (C. A. Baily) বলেছেন—বড় ব্যবসায়ী ও জমিদারদের কাছ থেকে নবাব বলপূর্বক অর্থ আদায় করতেন। তাই তাঁরা নবাবের বিরোধিতা করেছিলেন। অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী অবশ্য মনে করেন—জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সিরাজের বলপূর্বক অর্থ আদায়ের স্বপক্ষে সমসাময়িককালে ফার্সী ভাষায় রচিত কোন প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না। তবে একথা সত্যি যে, সিরাজ সে যুগের বাংলার অত্যন্ত ধনী মহাজন জগৎ শেঠের কাছ থেকে সৌকৎ জংকে দমন করার জন্য ৩০,০০০০,০০০ টাকা দাবী করেছিলেন। জগৎ শেঠের সংস্থা এই টাকা দিতে অস্বীকার করলে নবাব তাকে আঘাত করেন। তখন থেকেই বাংলার শেঠরা সিরাজের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন।

১৭৫৭ সালের গোড়াতে দেখা গেল বাংলার অভিজাততন্ত্রের একটাই উদ্দেশ্য ছিল—সিরাজকে যে ভাবে হোক নবাব পদ থেকে বিতাড়িত করা। ইতিমধ্যে সিরাজউদদৌল্লার সঙ্গো ইংরেজদের বিরোধিতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। কৃষ্ণদাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। তারপর সিরাজ দেখলেন যে বেসরকারি ইংরেজ বণিকেরা দস্তকের অপব্যবহার ঘটিয়ে নবাবকে শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছে। তারপর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় এশিয়ান বণিকেরাও দস্তক অপব্যবহারের সুযোগ নিয়ে বাংলার নবাবকে বাণিজ্য শুল্ক ফাঁকি দিতে লাগলেন। তদুপরি ভারতীয় পণ্য যখন ইংরেজ নিয়ন্ত্রণাধীন কলকাতায় প্রবেশ করত, তখন সেইসব পণ্যের ওপর ইংরেজ কোম্পানি শুল্ক ধার্য করতে শুরু করে। ফলে সিরাজের পক্ষে ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

নবাব ও ইংরেজ শক্তির মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠল যখন নবাব জানতে পারলেন যে ইংরেজরা তাঁর কোন অনুমতি ছাড়াই কলকাতায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেছে। সিরাজ অত্যন্ত সঠিকভাবেই এই ঘটনাকে তাঁর সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ বলে মনে করেছিলেন। এত ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সিরাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘাতে যেতে চাননি। তিনি ইংরেজদের সঙ্গো আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য নারায়ণ দাসকে কলকাতায় পাঠান। কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানির প্রধান রজার ড্রেক নারায়ণ দাসকে অপমান করলেন।

সিরাজ তৎক্ষণাৎ ইংরেজ শক্তিকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেন। সিরাজের সেনাবাহিনী কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করেন। ইংরেজরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সিরাজের বাহিনী ইংরেজদের ওপর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড বা লুন্ঠন কোনটাই চালায়নি। ঐতিহাসিক ব্রিজিন গুপ্তকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে ইংরেজরা নবাবের কাছ থেকে উদার ও মানবিক ব্যবহার পেয়েছিলেন। কোলেট ও ওয়াটস—এই দুই ইংরেজকে সঙ্গে নিয়ে নবাব কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। নবাবের বাহিনী ইংরেজ শক্তিকে পরাস্ত করে ১৭৫৬ সালের ২০ জনুন কলকাতা দখল করে। কোলকাতার ইংরেজ কোম্পানির গভর্নর ড্রেক ও তার অনুচরেরা কলকাতার দক্ষিণে ফলতা নামক স্থানে আশ্রয় নেন।

সিরাজ উদ্‌দৌল্লা এবং ইংরেজ কোম্পানির বিরোধের সূত্রপাত নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে মতপার্থক্য আছে। এস. সি. হিল (S. C. Hill)-এর মতে সিরাজের "ব্যক্তিগত অহংকার এবং অর্থলিপ্সা" (Personal vanity and avarice) এই বিরোধের জন্য দায়ী। কেমব্রিজ ঐতিহাসিক পিটার মার্শাল (Peter Marshall) তাঁর *Bengal : The British Bridgehead* প্রায় একই ধারণার বশবর্তী হয়ে বলেছেন—ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যই সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে ব্রিজিন গুপ্ত বলেছেন—ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধৃষ্টতা সিরাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। নিজ সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে নবাব ইংরেজদের কার্যকলাপে বাধা দিয়েছিলেন। ব্রিজিন গুপত্রে ভাষায়—একশত বছরের সম্পদশালী বাণিজ্য কতকগুলি ছোট ইংরেজ বণিককে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতে পরিণত করেছিল (A century of opulent trade converted the petty foggying merchants into imperialist swashbucklers)।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের জয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরাজিত ইংরেজরা ফলতায় পালিয়ে গিয়ে মাদ্রাজ থেকে সাহায্য আসার অপেক্ষায় বসেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে একটি অত্যন্ত সুদক্ষ ও পেশাদার ইংরেজ বাহিনী কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখল করে। ১৭৫৭ খ্রিঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী নবাব সিরাজ উদ্‌দৌল্লা ইংরেজদের সঙ্গে আলিনগরের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজদের ফ্যাক্টরি এবং বাণিজ্যিক অধিকারগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ইংরেজ কোম্পানি কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের এবং 'সিক্কা' টাকা তৈরির অনুমতি লাভ করে। নবাব কলকাতা আক্রমণের জন্য ইনরেজ কোম্পানিকে ক্ষতিপুরণ দিতে স্বীকৃত হন।

সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জগৎ শেঠ, মানিক চাঁদ, উমি চাঁদ, রায় দুর্লভ প্রভৃতিরা যে সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলেন, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা ধরনের বিতর্ক আছে। এস. সি. হিল বলেছেন—জগৎ শেঠ সংস্থা ও তার অনুগামীদের সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজের স্বৈরতান্ত্রিক মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। সি. এ. বেইলির বক্তব্যও মোটামুটি একরগকম। তাঁর মতে—ইংরেজ শক্তি যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ১৭৫৭ সালে বাংলা দখল করেছিল, তা ছিল হিন্দু বাণিজ্যিক শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবের ফল। নবাব বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করুক এটা তাঁরা চাননি।

বেইলি আরও বলেছেন—অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় ইংরেজ কোম্পানির সাথে বালংরা হিন্দু ও জৈন বণিকদের বাণিজ্যিক মস্পর্ক দৃঢ়ভাবে জড়িত ছিল। কে. এন. চৌধুরী ও ওমপ্রকাশ অষ্টাদশ শতকীয় ভারতের বাণিজ্যিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গো বলেছেন—১৭৪০ খ্রিঃ থেকেই জগৎ শেঠ সহ অন্যান্য ভারতীয় বণিকদের ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গো বাণিজ্য অত্যন্ত লাভজনক হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু অধ্যাপক সুশীল চৌধুরীর সাম্প্রতিক গবেষণা উপরোক্ত বক্তব্যকে খারিজ করেছে। প্রথমত, কেবলমাত্র ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিই যে ভারতে বুলিয়ন (সোনা-রূপা) আমদানি করত এ কথা ঠিক নয়। এমন কি তারা বৃহত্তম বুলিয়ন আমদানিকারীও ছিল না। দ্বিতীয়ত, পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় আর্মেনীয় বণিকসহ এশিয়ান বণিকদের বাণিজ্যের পরিমাণ ইউরোপীয় বণিকদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তৃতীয়ত, জগৎ শেঠ, উমি চাঁদ, খাজা ওয়াজিদ এই তিনজন ধনী বণিকের (এরাই সিরাজের বিরুদ্ধে প্রধানত ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন) আয়ের উৎস ঠিকমত অনুধাবন করলে দেখা যায় ইউরোপীয়দের সঙ্গো ব্যবসা করে তাঁরা যে অর্থ উপার্দন করতেন, অন্যান্য সূত্র থেকে তাঁদের আয়ের তুলনায় সেই আয় ছিল নিতান্ত কম। উমি চাঁদ ও খাজা ওয়াজিদের সম্পদ বৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল লবণ ও সোরার একচেটিয়া বাণিজ্য। জগৎ শেঠ তাঁর বাৎসরিক আয় ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকাই সুদের কারবার ও মুদ্র তৈরির মাধ্যমে উপার্জন করতেন।

সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেইলি, মার্শাল প্রমুখ কেমব্রিড ঐতিহাসিকেরা বলেছেন—এটি ছিল মূলত হিন্দুদের মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র। ইংরেজরা ঘটনাচক্রে এই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিল। এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন সুশীল চৌধুরী। তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন—ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্খাকে আড়াল করার স্বার্থেই এ ধরনের বক্তব্যের অবতারণ করা হয়েছে। তাছাড়া এই ষড়যন্ত্রকে কেবল হিন্দুদের ষড়যন্ত্র হিসাবে দেখাও ইতিহাস সম্মত নয়। আর্মেনীয় এবং মুসলমান বণিকরাও সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। রবার্ট ওর্মের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খাজা পেক্রস নামে এক আর্মেনীয় বণিক ইংরেজ কোম্পানির ওয়াটসকে জানিয়েছিলেন যে, মীরজাফল ইংরেজদের সঙ্গো হাত মেলাতে চান।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ইংরেজ কোম্পানি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বারা তাড়িত হয়ে সিরাজের সিংহাসন আরোহণের পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে। একই সাথে সিরাজের উচ্চভিলাষী আত্মীয়স্বজন, বাংলার ধনী বণিক ও মহাজনেরা এবং জমিদারেরা সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। উভয়পক্ষ তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য (সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করা) চরিতার্থ করার জন্য একে অপরের সাথে হাত মেলায়। ১৭৫৭ সালের ৪ জুন উভয়পক্ষের মধ্যে একটি বোঝাপড়া হয়। জুন মাসেই সিরাজ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন। কিন্তু বিরোধীদের দমন করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সিরাজ মীরজাফরকে নিজের দিকে নিয়ে আসার জন্য তাঁকেই আবার ‘বক্সি’ পদে নিয়োগ করেন। সমসাময়িক ইংরেজ লেখক লিউক স্ক্র্যাফটন (Luke Scrafton) এই ‘ভ্রান্ত’ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিরাজ উদদৌল্লার সমালোচনা করেছেন।

ইংরেজরা প্রথম থেকেই সিরাজকে তাড়াতে চেয়েছিল, কারণ তারা জানত যে, নবাব হিসাবে সিরাজের অস্তিত্ব তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি বিঘ্নিত করবে। মীরজাফর ও জগৎ শেঠরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের জাল বুনে ইংরেজদের কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছিলেন। মীরজাফরের লক্ষ্য ছিল বাংলার মসনদ। জগৎ শেঠ ও তাদের ঘনিষ্ঠরা মনে করেছিল সিরাজের পরিবর্তে অন্য কেউ নবাব হলে রাষ্ট্রের যাবতীয় দাবী না মেটালেও চলবে।

১৭৫৭ সালের ১৩ জুন রবার্ট ক্লাইভ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। মুর্শিদাবাদের কাছে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ সৈন্য ২৩শে জুন নবাবের বাহিনীর মুখোমুখি হয়। পলাশীতে নামমাত্র যুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ শক্তি সহজেই নবাবের বাহিনীকে পরাজিত করে। তবে সম্প্রতি ডেনমার্কের মহাফেজখানায় (Danish Archives) প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে মনে হয় যে, যত সহজে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল বলা হয়ে থাকে তত সহজে ইংরেজরা জয়লাভ করেনি। তাছাড়া রিয়াজ উস্ সালাতিনেল লেখক গোলমা হোসেন সলিম বলেছেন—নবাবের পক্ষেই জয়ের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। হঠাৎ কামানের গোলায় নবাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মীরমদন নিহত হলে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ইংরেজ লেখক লিউক স্ক্র্যাফটন (Luke Scrafton) পলাশীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাঁর বিবরণে লিখেছিলেন, “One great cause of our succes was that...we had the good fortune to kill Mir Madan.” অর্থাৎ আমাদের সাফল্যের অন্যতম বড় কারণ ছিল যে, আমাদের মীরমদনকে হত্যা করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মীরজাফল ও রায় দুর্লভের নেতৃত্বাধীন এক বিরাট সংখ্যক নবাবী সৈন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেদের যুদ্ধের প্রক্রিয়া থেকে বিরত রেখেছিল। ফলে পরাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ অনেকটাই সহজড হয়েছিল। পলাশীতে পরাস্ত সিরাজ মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। পথে মীরজাফরের লোকেরা তাঁকে হত্যা করে। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে মীরজাফলর বাংলার নতুন নবাব পদে আসীন হলেন।

৩৭.৩ মীরজাফল ও ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (১৭৫৭—১৭৬০)

জগৎ শেঠের সংস্থা বাংলার রাজস্ব বিষয়ে নতুন নবাব মীরজাফরের অংশীদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মীরজাফরের নিরাপত্তার জন্য এই মিত্রতা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ক্লাইভ মীরজাফরকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জগৎ শেঠের মতামত নিয়ে চলেন। মীরজাফরকে বাংলার নবাব নিযুক্ত করার আগে ইংরেজ কোম্পানি তাঁর সঙ্গে কতগুলি চুক্তি করে। চুক্তিগুলো ছিল এই রকম—(১) ইংরেজ কোম্পানি বাংলাদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার এবং সবরকম বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা পাবে। (২) টাকা তৈরির একচেটিয়া অধিকার আর জগৎ শেঠের হাতে থাকল না ; ইংরেজ কোম্পানিও নবাবের কাছ থেকে টাকা তৈরির অধিকার লাভ করে। (৩) কোম্পানি চব্বিশ পরগণা জেলার জমিদারী পেল এবং বলা হল ঐ অঞ্চল থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব দিয় ক্লোপানি তার সামরিক ব্যয় নির্বাহ করবে। (৪) কলকাতার ওপর নবাবের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। (৫) মুর্শিদাবাদে

একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত থাকবে। (৬) প্রয়োজনে কোম্পানি বাংলার নবাবকে সামরিক সাহায্য দেবে।

চুক্তির শর্তগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, সরাসরি বাংলার শাসনভার গ্রহণ না করলেও ইংরেজ কোম্পানি বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেদের আধিপত্য ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল যদুনাথ সরকার তাই পলাশীর যুদ্ধকে ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বিভাজন রেখা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে, ইংরেজদের বিজয় ভারত ইতিহাসে এক "গৌরবময় ভোরের" (Glorious Dawn) সূচনা করেছিল। কিন্তু পলাশীর বিজয় যে ইংরেজ শক্তির ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঔপনিবেশিক শাসন গড়ে তোলার পথ উন্মুক্ত করেছিল, সে বিষয়টির ওপর যদুনাথ গুরুত্ব আলোপ করেননি। ইংরেজরা ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শন ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য সিরাজেডর বিরোধিতা করেনি। নিজেদের দেশে শিল্পবিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত করার তাগিদে বাংলা তথা ভারতের ওপপর অবাধ লুন্ঠন চালনৌোরে উদ্দেশ্যেই তারা পলাশীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

মীরজাফর যখন বাংলার নবাব হলেন তখন বাংলার আর্থিক সঙ্কট চরমে পৌঁছেছিল। সৈন্যদের নিয়মিত বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই তাদের মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। মীরজাফরের আমলে বাংলায় তিনটি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল—মেদিনীপুরের জমিদার রাজারাম সিংহের বিদ্রোহ, পূর্ণিয়াতে হজরৎ আলিশাহ্ ও অচল সিং-এর বিদ্রোহ এবং পাটনায় রামনায়ারণের বিদ্রোহ। প্রথম দুটি বিদ্রোহ মীরজাফর ইংরেজদের সাহায্যে দমন করেছিলেন। কিন্তু পাটনার রামনারায়ণ ক্লাইভের সঙ্গো একটি গোপন সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। ক্লাইভ মীরজাফরের হাত থেকে রামনারায়ণকে নিরাপত্তা দেবার আশ্বাস দেন। মীরজাফল জানতেন যে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলি সংগঠিত করার পেছনে রায় দুর্লভের হাত আছে। কিন্তু রায় দুর্লভের সঙ্গোও ক্লাইভের গোপন আঁতাত ছিল। মীরজাফল ইংরেজদের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন যে, ক্লাইভের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর পক্ষে রামনারায়ণ বা রায় দুর্লভ কাউকেই দমন করা সম্ভব ছিল না। রামনারায়ণকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেবার বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানি উত্তর বিহারে সোরা ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। স্ক্র্যাফটনের লেখা থেকে জানা যায়—মীরজাফর যাতে কখনোই ইংরেজ বিরোধী না হয়ে ওঠেন সেদিকে নজর রাখার জন্য ক্লাইভ মীরজাফরের দরবারে একটি মীরজাফর বিরোধী গোষ্ঠীকে সক্রিয় রেখেছিলেন।

মীরজাফরের শাসনকালে দিল্লীর মোগল শক্তি বিহার আক্রমণ করে। ১৭৫৯ সালে শাহজাদা (যিনি পরে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম হয়েছিলেন) বিহার আক্রমণ করেন। সিরাজের অনুগত জমিদারেরা শাহ্জাদাকে সমর্থন করেন। ক্লাইভের সহায়তায় মীরজাফর এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৭৬০ সালে শাহ্ আলম আবার বিহার আক্রমণ করেন। বিহারের জমিদারেরা ছাড়াও বীরভূম ও পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জমিদারেরা শাহ্ আলমের পক্ষে যোগ দেন। ইংরেজ বাহিনী মীরজাফরের হয়ে যুদ্ধ করে এবং শেষপর্যন্ত ইংরেজ বাহিনীর হাতে শাহ্ আলম পরাস্ত হন। মীরজাফর ইংরেজ শক্তির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং তাঁর দুর্বলতা স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়।

যুদ্ধ করে মীরজাফরকে রক্ষা করার বিনিময়ে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মীরজাফরের কাছ থেকে প্রচুর টাকা দাবী করেছিল। কিন্তু বাংলার আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, মীরজাফরের পক্ষে কোম্পানীর দাবী মেটানো সম্ভব ছিল না। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মীরজাফল ইংরেজ কোম্পানিকে ১৭,৭০০,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। তার ওপর কোম্পানির কর্মচারীদের বহু টাকার উৎকোচ ও মূল্যবান সমস্ত উপঢৌকন দিতে হয়েছিল। ক্লাইভ একাই ২০ লক্ষেরও বেশি টাকা এবং ওয়াট্‌স ১০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। ক্লাইভ পরবর্তীকালে হিসেব করে বলেছিলেন যে, কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা বালংরা ক্রীড়নক নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে ৩ কোটি অর্থমূল্যের সম্পদ পেয়েছিল।

কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের এত কিছু দেওয়া সত্ত্বেও এক বিরাট আর্থিক বোঝা নিয়ে মীরজাফর নবাব পদে বসেছিলেন। পরাশীর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংরেজদের দাবী ছিল ৩০ লক্ষ স্টার্লিং। কিন্তু সে মুহূর্তে মীরজাফরের পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। ঠিক হয় যে এই টাকার অর্ধেক জগৎ শেঠ কোম্পানিকে দেবে। বাকি অর্ধেক নবাব তিন বছর ধরে কিস্তিতে কিস্তিতে দিয়ে যাবেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ক্লাইভকে নিশ্চিত করেনি। ১৭৫৮ সালে ক্লাইভ তিনটি বড় জেলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার দাবী করেন। এপ্রিল মাসে মীরজাফর কোম্পানিকে নদীয়া ও বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের অধিকার ন্যস্ত করতে বাধ্য হন। ইংরেজ কোম্পানি যেহেতু সে সময় বাণিজ্য ছাড়াও রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল, কোম্পানির ব্যয় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নবাবের কাছে কোম্পানির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৫৮ সালের শেষ দিকে কোম্পানি দাবী করে যে, যতদিন কোম্পানির সৈন্যরা নবাবের হয়ে যুদ্ধ করবে, সেই সময় নবাব কোম্পানিকে মাসে ১ লক্ষ টাকা করে দিয়ে যাবেন। কোম্পানির চাপে মীরজাফর এই দাবীও মেনে নিতে বাধ্য হন। এই সময় ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার ওপর কোম্পানির বম্বে ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে কোলকাতা থেকে নিয়মিত টাকা পাঠাতে হত। সামরিক খাতে কোম্পানির ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে কোম্পানি এক রচম আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়।

এই আর্থিক সঙ্কট মোচনের জন্য কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা বাংলাদেশে পুনরায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। ১৭৬০ সালের গোড়াতেই ক্লাইভ ইংল্যাণ্ডে ফিরে পান। তখন থেকেই মীরজাফরের নবাব পদে বহাল থাকার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়েওঠে। ইংরেজ কোম্পানির গভর্নর হিসাবে ক্লাইভের উত্তরসূরী হলওয়েল মীরজাফরকে পছন্দ করতেন না। তিনি ও তাঁর সহযোগী ইংরেজার মীরজাফরের অপশাসনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার ওপর মীরজাফর যখন ইংরেজ কোম্পানির ক্রমবর্ধমান আর্থিক দাবী মেটাতে ব্যর্থ হলেন, তখন কোম্পানি কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ১৭৬০ সালের অগাস্ট মাসে ভ্যান্সিটার্ট কর্ণেল ক্যালিউডকে জানিয়েছিলেন যে মীরজাফর যদি কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা বা সমমূল্যের জমি দেন, তবে তিনি নবাব হিসাবে থাকতে পারবেন। কিন্তু মীরজাফরের পক্ষে তখন কিছুই দেওয়া সম্ভব ছিল না। তখন কোম্পানি মীরজাপরের কাছে বর্ধমানের সমৃদ্ধশালী জমিদারী এবং মেদিনীপুর ও চটট্টগ্রাম জেলা দুটি সরাসরি দাবী করে। মীরজাফল

কোম্পানির এই প্রস্তাবে রাজী হননি। তখনই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মীরজাফরকে পদচ্যুত করে নতুন নবাব নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইংরেজরা মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার শুরু করে। মীরকাশিম ইংরেজদের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি কোম্পানির আর্থিক সঙ্কট মোচনের জন্য প্রয়োজনী ব্যবস্থা নেবেন এবং বর্ধমানের জমিদারী সহ চট্টগ্রাম ও মেদীপুর জেলা দু'টি কোম্পানির হাতে তুলে দেবেন। বিনিময়ে মীরকাশিম বাংলার ডেপুটি সুবাদারের পদ লাভ করবেন। কিন্তু মীরজাফর এই বন্দোবস্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি মীরকাশিমকে ডেপুটি সুবাদার পদে গ্রহণ করলেন না।

তখন ১৭৬০ সালের অক্টোবর মাসে ভ্যান্সিটার্ট ও ক্যালিউড শক্তি ও ভীতি প্রদর্শন করে মীরজাফরকে পদচ্যুত করেন। মীরকাশিমকে নতুন নবাব নিযুক্ত করা হয়। রক্তপাতহীন ও নিঃশব্দ এই "বিপ্লব"-এর গুরুত্ব কম ছিল না। মীরজাফরের পদচ্যুতি স্পষ্টই প্রমাণ করেছিল ইংরেজরাই বাংলাদেশে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং রাজা তৈরির নায়ক (King maker)। ইংরেজ কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা বুঝিয়ে দিয়েছিল—যে ব্যক্তি তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এবং ক্রমবর্ধমান সম্পদ লালসা মেটাতে সাহায্য করবে, তাকেই তারা বাংলার নবাব পদে বসাবে।

৩৭.৪ মীরকাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬০—১৭৬৪)

১৭৬০ সালে বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত হয়েই মীরকাশিম ইংরেজ কোম্পানির হাতে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের জমিদারী তুলে দেন। যে সমস্ত ইংরেজ তাঁকে নবাব হতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা মূল্যের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল মীরকাশিমকে দিয়ে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু ইংরেজরা অচিরেই আশাহত হয়েছিল।

মীরকাশিম মীরজাফরের মতো অপদার্থ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি পূর্ব ভারতে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যের সমস্যাগুলি বোঝার ব্যাপারে তিনি তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে বাংলাকে একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে হড়ে দু'টি পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমত, মারাত্মক আর্থিক সঙ্কট থেকে বাংলাকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয়ত, একটি সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা।

নবাব হওয়ার পরেই মীরকাশিম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন। প্রথমেই তিনি ইংরেজদের প্রিয়পাত্র পাটনার দেওয়ান রামনারায়ণকে ক্ষমতুচ্যুত করেন। রামনারায়ণের কাছে নবাবের প্রচুর টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু সে টাকা মিটিয়ে দিতে রামনারায়ণ অহেতুক দেরী করেছিলেন। তাছাড়া রামনারায়ণ কখনোই নবাবের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য দেখাননি। তাই মীরকাশিম তাঁকে বিতাড়িত করে হত্যা করেন। রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য মীরকাশিম আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তিনি জায়গীরগুলির ওপর নবাবী কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নতুন করে কর ধার্য করেন। যে সব জমিদারীগুলিতে নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল অল্প, সেখানে বর্ধিত রাজস্বের বোঝা চাপানো হল।

যদিও মীরকাশিম শাসনতন্ত্রের প্রত্যেক স্তরেই দক্ষতা এনে রাজস্ব বাবদ রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তবুও সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে তাঁর নির্ধারিত রাজস্বের একটা বৃহৎ অংশই আদায় করা যায়নি। ইংরেজদের পাওনা মেটানোর জন্য জগৎ শেঠদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উপরোক্ত কার্যসিদ্ধি হবার পর মীরকাশিম জগৎ শেঠ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গাদের তাঁর নতুন ব্যবস্থা থেকে বাদ দিলেন।

সামরিক সংস্কারের ক্ষেত্রে মীরকামিশম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পতক্ষেপ নিয়েছিলেন। প্রথমেই তিনি তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। ৯০,০০০ সৈন্য নিয়ে গড়ে ওঠা পুরনো নবাবী বাহিনীকে তিনি বাতিল করেন। পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের একটি সুদক্ষ বাহিনী তিনি গড়ে তোলেন। এই নতুন বাহিনীকে পাশ্চাত্য কৌশলে সুশিক্ষিত করার জন্য গুর্গিন খান নামে এক আর্মেনীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা হয়। মুঙ্গেরে অস্ক্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। ইংরেজদের কাছে বিষয়টি গোপন রাখার জন্যই ইংরেজ ঘাঁটি কলকাতা থেকে বহূদূরেপ মুঙ্গেরে মীরকাশ্মি তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ইংরেজরা প্রথম দিকে মীরকাশিমের ওপর মোটামুটি সন্তুষ্টই ছিল। কোম্পানি তিনটি জেলার জমিদারী লাভ করে এবং সিলেক্‌চ কমিটির সদস্যরাপ্রচুর মূল্যবান উপহার পেয়ে খুশী হয়েছিল। বিহারে গৃহীত কঠোর পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে ইংরেজরা মনে করেছিল মীরকামিশম বিহারে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ রামনারায়ণের পদচু১তি ও হত্যা কিছু ইংরেজকে অখুশী করলেও সাধারণভাবে বিষয়টিকে তারা কুনজরে দেখেনি, কারণ গভর্নর ভ্যান্সিচটার্টই স্বয়ং রামনারায়ণের ওপর অতুষ্ট ছিলেন।

১৭৫৭ সালের পর কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বেসরকারি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল. এই বেসরকারি বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে মীরকাশিম ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে সম্পর্কের অবনতির সূত্রপাত। ইংরেজ বণিক ও তাদের ভারতীয় দালালেরা এমন সব এলাকায় বাণিজ্যে লিপ্ত হতে লাগলেন যেখানে তারা আগে প্রবেশ করেনি। এমন সব পণ্য তারা ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগল যে সব পণ্যের ওপর এতদিন পর্যন্ত বাংলা সরকারের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার স্বীকৃত ছিল। লবণ ব্যবসা ছিল এরকম একটি বিষয়। লবণ তৈরির ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর ইংরেজ বণিকরা সমগ্র বাংলাদেশে লবণ বিক্রি করার নিজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলে। লবণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রকিরয়া নবাবের একচেটিয়া কারবারের অধিকারকে সরাসরি লঙ্ঘন করেছিল। এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই মীরকাশিমকে ক্রুদ্ধ করেছিল।

নবাবের একচিটেয়িা বাণিদিজ্যক অধিকারেরর সঙ্গো যুক্ত হয়েছিল ইংরেজ বণিকদের দ্বারা দস্তকের মারাত্মক অপব্যবহার। মীরকাশিম দেখলেন যে, দস্তকের অপব্যবহারের ফলে বাংলার অর্থনীতি দু'ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। (১) হাণিজ্যশুল্ক বাবদ রাষ্ট্রের আয় কমছে। (২) এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার ফলে দেশীয় বণিকদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। নবাবের কর্মচারীরা ইংরেজ বণিকদের বেআইনী ব্যবসা বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নিলেন। বেশকিছু লবণবাহী নৌকো আটক করা হল। ১৭৬২

সালের জুন মাসে ভ্যান্সিটার্ট নিজে স্বীকার করলেন যে তিনি ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের লবণ ব্যবসায়ের জন্য দস্তক দিয়েছেন। শুধু লবণের ক্ষেত্রে নয় পান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও ইংরেজ বণিকেরা দস্তকের অপব্যবহার ঘটিয়ে নবাবকে প্রচুর বাণিজ্যশুল্ক ফাঁকি দিত। তামাক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও তারা নবাবকে নামমাত্র বাণিজ্যশুল্ক দিত।

ইংরেজ বণিকদের বিনা শুল্কে বা অত্যল্প শুল্কে বাণিজ্য করার ফলে কেবল ভারতীয় বণিকরাই নয় আর্মেনীয় বণিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বিহারের সোরা কারবারের ওপর ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হবার ফলে আর্মেনীয় বণিকরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তার ওপর এই অসম প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ বিঘ্নিত করেছিল। মীরকাশিম বুঝেছিলেন যে আর্মেনীয়দের সঙ্গো তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে তাদের ক্ষোভের নিরসন করা দরকার। তার ওপর মীরকাশিমের কাছে অভিযোগ আসে, ইংরেজ বণিকরা দেশীয় ব্যবসায়ীদের ওপর বলপ্রয়োগ করে বা তাদের ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যের থেকে অনেক সস্তায় পণ্য খরিদ করতেন। ১৭৬২ খ্রিঃ মে মাসে মীরকাশিম এসব বিষয় নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে লিখিত অভিযোগ জানান। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। নবাব কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে একের পর এক অভিযোগ জানিয়ে গেলেন। কিন্তু দস্তকের অপব্যবহার অথবা কোম্পানি কর্মচারীদের দেশীয় বণিক ও কৃষক উৎপাদনকারীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ নিল না। তখন নবাব কঠোর পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধন্ত নিলনে। ১৭৬২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলার বিভিন্ন নদীমুখে ইংরেজ বণিকদের পণ্যবাহী নৌকো মীরকাশিমের কর্মচারীরা আটক করলেন।

এই পরিস্থিতিতে ১৭৬২ সালের শেষ দিকে নবাবের সঙ্গো আলোচনার জন্য ভ্যান্সিটার্ট মুঙ্গের যান। ভ্যান্সিটার্ট মীরকাশিমকে আশ্বাস দিলেন যে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করেও তিনি ইংরেজ বণিক ও তাঁদের গোমস্তাদের যাবতীয় অপকর্ম বন্ধ করবেন। মীরকাশিম বলেন যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকদের ওপর ৯ শতাংশ হারে শুল্ক ধার্য করা হবে। সেখানে দেশীয় বণিকদের ওপর শুল্ক ধার্য হবে ২৫ শতাংশ হারে। ভ্যান্সিটার্ট এই প্রস্তাব মেনে নেন এবং নবাবকে কথা দেন যে ভবিষ্যতে বাণিজ্য সংক্র্ান্ত কোন বিরোধ বা সমস্যা দেখা দিলে নবাবের কর্মচারীরা তার নিষ্পত্তি করবেন। কিন্তু একগুঁয়ে কলকাতা কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা জানিয়ে দেয় যে বেসরকারি ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজদ বণিকরা ২$^{১}/_{২}$ শতাংশের বেশি শুল্ক দেবে না এবং ইংরেজ বণিকদের বিচার করবেন ইংরেজরা, নবাবের কর্মচারীরা নয়।

এই অবস্থায় মীরকাশিম তাঁর কর্মচারীদের অবাধ্য ইংরেজ বণিকদের কঠোর হাতে দমন করার নির্দেশ দিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ বণিক ও নবাবের কর্মচারীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। তার ওপর মীরকাশিম আরেকটি কঠোর সিদ্ধান্ত নেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি যাবতীয় শুল্ক তুলে দেন। অর্থাৎ ভারতীয় ও অন্যান্য বহণিকদেরও আর কোন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যশুল্ক দিতে হবে না। ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর কোন অসম প্রতিযোগিতা রইল না। এর ফলে রাষ্ট্রের আয় বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেল বটে, কিন্তু দেশীয় বণিকদের রক্ষা করার এছাড়া কোন উপায় ছিল না। ইংরেজ

বণিকরা নবাবের এই সিদ্ধান্তে অসম্ভব ক্রুদ্ধ হলেন। মীরকাশিম ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মীরকাশিমের সঙ্গো ইংরেজদের সংঘর্ষের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকরা নানারকম মত দিয়েছেন। মীরকাশিমের সমসাময়িক এক ইংরেজ কর্তাব্যক্তি ভেরেলেস্ট মন্তব্য করেছেন—দস্তকের অপব্যবহার বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নয়, মীরকাশিমের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এই সংঘর্ষের জন্য দায়ী। ভেরেল্‌স্‌টর বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে ঐতিহাসিক ডডওয়েল বলেছেন—মীরকাশিম ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে যুদ্ধের অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। পি. জে. মার্শাল বলেছেন—মীরকাশিম প্রথম থেকেই বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর তিন বছরের নবাবী শাসনে পূর্ব ভারতে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার আন্তরিক প্রয়াস পপরিলিক্ষিত হয়েছিল। সুতরাং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা দেখা না দিলেও অন্য কোন অজুহাতে তিনি ইংরেজ বিরোধী সংঘাতে অবতীম৪ হতেন। কিন্তু অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেছেন—মীরকাশিমের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, বা ইংরেজ নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করার অভিপ্রায় নয়, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধই ইংরেজ ও মীরকাশিমের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য দায়ী। রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় ফিরে আসাবর পর ১৭৬৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি লণ্ডনে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীকে পাঠানো একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "Inland trade had been the foundation of all bloodshed, massacre and confusion which have happened of late years in Bengal." অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালের বাংলায় যাবতীয় রক্তপাত, হত্যা এবং ঝামেলার মূলে রয়েছে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। ক্লাইভের এই চিঠি অধ্যাপক চৌধুরীর বক্তব্যের সত্যতাই প্রমাণ করে। মালদার রেসিডেন্ট গ্রে বেসরাকরি ইংরেজ বণিক ও তাদের গোমস্তাদের নবাবকে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া এবং দেশীয় বণিক ও কৃষক-উৎপাদনকারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর জন্য তীব্র নিন্দা করেছেন। বেসরকারি ইংরেজ বণিকদের অন্যায় আচরণ বন্ধ করার বিষয়ে মীরকাশিম যখন বদ্ধপরিকর হলেন, তখন ইংরেজ কোম্পানি তাঁর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হবার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৭৬৩ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গো মীরকাশিমের যুদ্ধ শুরু হয়। মীরকাশিম পরপর কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উদয়নালা ও মুঙ্গোরের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। মীরকাশিম অযোধ্যায় পালিয়ে যান। যে মুহূর্তে ইংরেজদের সঙ্গো মীরকাশিমের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সে মুহূর্তে ইংরেজরা বাংলার মসনদ থেকে মীরকাশিমকে অপসারিত করে মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদে পুনঃপ্রতির্ষ্ঠিত করেন। সমস্ত বাণিজ্যশুল্ক তুলে দেবার যে আদেশ মীরকাশিম দিয়েছিলেন, নবাব হবার পরই মীরজাফর তা প্রত্যাহার করে নেন। ইংরেজ কর্মচারীরা বিনা শুল্কে বেসরাকরি বাণিদ্য করার অনুমতি পেল। বলা হল, কেবলমাত্র লবণের ওপর ইংরেজ বণিকেরা $২^{১}/_{২}$ শতাংশ হারে বাণিজ্যশুল্ক দেবেন। তাছাড়া কোম্পানির যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য মীরজাফর কোম্পানিকে মাসিক ৫ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন। বাংলা নবাবীর স্বাধীন সত্তা বলে কিছু রইল না। বাংলার প্রতিরক্ষা পুরোপুরি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে গেল।

পরপর যুদ্ধগুলিতে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হলেও মীরকাশিম হতোদ্যম হননি। তিনি ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে শেষ লড়াইএ অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্‌দৌল্লা এবং দিল্লীর তৎকালীন মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গো যোগাযোগ করে একটি ইংরেজ বিরোধী মের্চা তৈরি করেন। ১৭৬৪ সালের অক্টোবর মাসে এই তিন শক্তির মিলিত বাহিনীর সঙ্গো ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ বক্সারের যুদ্ধ নামে খ্যাত। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি ১৭৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর উপরোক্ত তিন ভারতীয় শক্তির মিলিত বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম তৎক্ষণাৎ ইংরেজ পক্ষে যোগ দেন। সুজা উদ্‌দৌল্লা রোহিলখণ্ডে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। মীরকাশিম আত্মগোপন করেন। ১৭৭৭ সালে মীরকাশিম মারা যান।

বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পলাশীর প্রান্তর থেকে ইংরেজ শক্তি যে বিজয় অভিযান আরম্ভ করেছিল বক্সারের তা সম্পূর্ণতা লাভ করে। বাংলাদেশের ওপর ইংরেজ কোম্পানির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া এই যুদ্ধে ইংরেজরা কেবল বাংলার নবাবকে নয়, অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর মোগল বাদশাকেও পরাস্ত করেছিল। ফলে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংরেজদের গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ক্ষমতা বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির বিজয় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সুদুরপ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করেছিলন।

৩৭.৫ ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

১৭৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মীরজাফর মারা যান। বাংলায় নতুন নবাব হন মীরজাফর পুত্র নজম উদ্‌দৌল্লা। ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজরা নজম উদ্‌দৌল্লার সঙ্গো একটি চুক্তি করে। এই চুক্তিতে বলা হয় ইংরেজদের মনোনীত এক ব্যক্তি বাংলার নায়েব নাজিম বা ডেপুটি সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং তিনিই বাংলার শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি দেখাশোনা করবেন। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গো আলোচনা না করে নবাব নায়েব নাজিমকে পদচ্যুত করতে পারবেন না। ইংরেজ কোম্পানি মহম্মদ রেজা খানকে নায়বে নাজিম পদে মনোনীত করে। রেজা খানের মাধ্যমে বাংলার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ইংরেজরা হস্তগত করে এবং নবাব নজম উদ্‌দৌল্লাকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৭৬৫ সালের মে মাসে ক্লাইভ বাংলাদেশে পুনরায় ফিরে আসেন।

বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির বিজয়ের পর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উত্থান ঘটেছিল, সেই পরিস্থিতিকে ক্লাইভ ইংরেজ শক্তির স্বার্থে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। যেহেতু মীরকাশিম ছাড়াও অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্‌দৌল্লা এবং দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম ইংরেজদের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন সেহেতু ক্লাইভ বাংলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইংরেজ আধিপত্য অনায়াসেই কায়েম করতে পারতেন। কিন্তু ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ রবার্ট ক্লাইভ সেই মুহূর্তে এই বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। তিনি ইংরেজ শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ক্লাইভ দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম এবং সুজা উদ্‌দৌল্লার সঙ্গো একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৭৬৫ সালের ১২ই অগাস্ট এলাহাবাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত

হয়। সুজা উদ্‌দৌল্লা তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন। বিনিময়ে তিনি ইংরেজ কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হলেন। কেবলমাত্র কারা এবং এলাহাবাদ অযোধ্যা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে মোগল সম্রাটকে দিয়ে দেওয়া হল। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল। বিনিময়ে শাহ্ আলম একটি ফরমানের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি ইংরেজ কোম্পানির হাতে তুলে দেন। ইংরেজরা এর বিনিময়ে শাহ্ আলমকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতিবন্ধ হয়। তাছাড়া ইংরেজরা বাংলার নবাব নজম উদ্‌দৌল্লাকে বাৎসরিক ভাতা হিসাবে ৫৩ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়।

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা দেওয়ানি লাভ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দেওয়ানি লাভ করে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ অধিকার লাভ করে। এই অধিকার লাভ করার ফলে কোম্পানি আর্থিক দিক যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল। মীরকাশিমের সঙ্গো যুদ্ধ করে কোম্পানির প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। শাহ্ আলমের থেকে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ক্লাইভ ইংরেজ কোম্পানির আর্থিক সঙ্কট মোচন করতে চেয়েছিলেন। এই প্রয়াসে তিনি সফলও হয়েছিলেন।

তাছাড়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। বাংলার প্রাদেশিক অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করার আইনী স্বীকৃতি লাভ করেছিল ইংরেজরা। আর এই অধিকার তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট। নজম উদ্‌দৌল্লার সঙ্গো চুক্তি স্বাক্ষর করে ইংরেজরা আগেই বাংলার অভ্যন্তরীণ শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করার অইধকার লাভ করেছিল। শাহ্ আলমের ফরমান তাদের রাজস্ব আদায়ের অধিকার দিয়েছিল।

৩৭.৬ সারাংশ

বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজরা যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ফলে সামরিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তাদের আরও সাফল্যলাভের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি লাভের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গেল যে ১৭৬৫ সালের পর থেকে ইংলান্ড থেকে সোনা-রূপা বা বুলিয়ন আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। পলাশীর আগে বাংলাদেশের বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য ইংরেজ বণিকরা দেশ থেকে প্রচচর পরিমাণে বুলিয়ন আনত। পরাশীর পর থেকে তারা যে সম্পদ আহরণ করতে শুরু করেছিল তা দিয়েই তারা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করত। ফলে তখন থেকেই ইংল্যন্ড থেকে বুলিয়ন আমদানি হ্রাস পেতে থাকে। দেওয়ানি লাভের পর বাংলার রাজস্ব াবাবদ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোমাপানির যে আয় হত, তা ছিল বিনিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট বেশি। তাই ১৭৬৫ সালের পর ইউরোপ থেকে সোনা, রূপা আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকেই বাংলার নবাবরা ইংরেজ শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। বক্সারের যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজরা তাদের ক্ষমতা আরও নিরঙ্কুশ করেছিল। ১৭৬৫

সালে ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলার নবাবদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের শেষ রেখাটুকু মুছে গেল।

৩৭.৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

২। ১৭৫৭ সালে থেকে ১৭৬৪ সালে পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে বাংলাদেশে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

৩। ইংরেজ ইস্ট কোম্পানির দেওয়ানি লাভের তাৎপর্য আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

৪। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গো সিরাজ উদ্‌দৌল্লার বিরোধের কারণগুলি লেখ।

৫। ইংরেজ কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা কেন মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদ থেকে অপসারিত করেন ?

৬। বাংলার দেওয়ানি লাভ কিভাবে ইংরেজ কোম্পানিকে উপকৃত করেছিল ?

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন :

৭। সিরাজের কোন দু'জন আত্মীয় সিরাজ নবাব হবার ফলে ক্ষুব্ধ হন ?

৮। আলিনগরের চুক্তি কাদের মধ্যে এবং কত সালে হয়েছিল ?

৯। পলাশীর যুদ্ধের সময় ইংরেজ কোম্পানির প্রধান কে ছিলেন ?

১০। মীরকাশিম বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কোথায় স্থানান্তরিত করেন ?

১১। এলাহাবাদ চুক্তি কবে ও কাদের মধ্যে সম্পাদিত হয় ?

৩৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Susil Chaudhuri : *Prosperity and Poverty in Bengal,* Delhi, 1997.
2. ________ 'Sirajuddaulah, the English Company and the Plassey Conspiracy' in *Indian Historical Review,* 1986—87, Vol. 13 (1-2).
3. P. J. Marshall : *Bengal : The British Bridgehead,* Cambridge, 1987.
4. C. A. Bayly : *Indian Society and the Making of the British Empire,* Cambridge, 1988.
5. Brijin Gupta : *Sirajuddaulah and the East India Company, 1765—57,* Leiden, 1962.

6. S. C. Hill : *Bengal in 1765—57,* Vol. 1—3, London, 1905.
7. Rajat Kanta Ray : 'Colonial Penetration and the Initial Resistance : The Mughal Ruling Class, the English East India Company and the struggle for Bengal 1756—1800' in *Indian Historical Review,* 1985—86, Vol. 12 (1—2).
8. Benoy Chaudhury : 'Political History' in N. K. Sinha (ed.), *The History of Bengal (1757—1905),* Calcutta 1967.
9. Suranjan Chatterjee and Siddhartha Guha Ray : *History of Modern India,* Calcutta, 1997.
10. রজত কান্ত রায় : *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ,* কলকাতা, ১৯৯৪।
11. সিদ্ধার্থ গুহরায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস,* কলকাতা, ১৯৯৬।